

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপন্যাস :	
ক. ভূমিকা	১-১০
খ. ১৯৭১ (মূলপাঠ)	১১-৫৭
গ. শব্দার্থ ও টীকা	৫৭-৫৮
ঘ. অনুশীলনী	৫৯-৬১
নাটক :	
ক. ভূমিকা	৬২-৬৭
খ. বহির্পীর (মূলপাঠ)	৬৮-৯৩
গ. শব্দার্থ ও টীকা	৯৩-৯৩
ঘ. অনুশীলনী	৯৪-৯৬

ভূমিকা

ক. উপন্যাস কী?

‘উপন্যাস’ সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা বা পরিভাষা। সাহিত্যের অনেকগুলো রূপ। তার মধ্যে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প – এ পাঁচটি প্রধান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এবং জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকে কার্যকরভাবে উপস্থাপনার সক্ষমতায় উপন্যাসকে অনেকে আধুনিক যুগের সবচেয়ে সফল সাহিত্যরূপ বলে মনে করেন।

উপন্যাসে কাহিনি থাকে। কাহিনি ঘটনার সমষ্টি। নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মিলনবিন্দুতে এক-একটি ঘটনা ঘটে। এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনার সমবায়ে কাহিনি গড়ে ওঠে। তবে কাহিনিমাত্রই উপন্যাস নয়। উপন্যাসে কাহিনিকে বিভিন্নভাবে সাজানো হয়। পরের ঘটনা আগে আসে, আগেরটা পরে। বিভিন্ন উপকাহিনি বা সমান্তরাল কাহিনি যুক্ত হয়। কাহিনির এ বিন্যাস বা সজ্জাকে বলা হয় প্লট। কাহিনিতে যখন একের পর এক ঘটনা ঘটে, তখন আমরা একটি ঘটনাকে আরেকটি ঘটনার সাপেক্ষে পাঠ করি। আমাদের মনে এ উপলব্ধি হয় যে, একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার সাথে কার্যকারণসূত্রে যুক্ত। অর্থাৎ, একটির কারণেই ফল হিসেবে অন্য একটি ঘটনা ঘটছে। এ কথা বিবেচনায় রাখলে কাহিনিসজ্জা বদলে ফেলার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। যদি লেখক তুলনামূলক পরে সংঘটিত একটি ঘটনা আগে বর্ণনা করেন, তাহলে ঘটনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যাবে বদলে। সেক্ষেত্রে তৈরি হবে ভিন্ন ধরনের উপলব্ধি। কাহিনিবিন্যাসের এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করে ‘উপন্যাসিক’ কোনো ঘটনা বা মুহূর্তকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে পাঠকের মনের প্রতিক্রিয়াকে বিশেষভাবে পরিচালিত করেন। এ কারণেই উপন্যাসে কাহিনির তুলনায় প্লটকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঘটনার অবলম্বন চরিত্র। সাহিত্য মানুষের জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ। নিখিল মানবসমাজের অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জীবনসত্য উন্মোচিত হয় সাহিত্যে। কিন্তু তার প্রধান অবলম্বন ব্যক্তি। ব্যক্তি-মানুষের সূত্র ধরেই সাধারণভাবে সমষ্টির কথা উঠে আসে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কথটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে সমগ্র কাঠামোর মধ্যে জিন্মাশীল ব্যক্তি-মানুষের ছবি অঙ্কিত হয়। ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার ঘটনার মধ্য দিয়ে বা ঘটনার জিন্মা-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির রূপান্তর ঘটে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম দিকগুলো প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে সাধারণভাবে এ ব্যক্তিই ‘চরিত্র’ হিসেবে অভিহিত হয়।

তবে চরিত্র কথটার অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। একজন মানুষকে আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করি। আমরা ব্যক্তির মূল্যায়ন করি, এবং তার কোনো বৈশিষ্ট্য মানুষের বৃহত্তর ভালো-মন্দের ধারণার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত, তা বিবেচনা করি। উপন্যাসে ব্যক্তি কিন্তু অনেক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাসের ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের বৃহত্তর মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য বা মানুষের গভীরতর প্রকৃতির বোধ জন্মে। এদিক থেকে একজন লেখক মানুষের কোন স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র তৈরি করছেন, তা বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন, কোনো মানুষ হয়ত কোনো আদর্শের প্রতি খুবই অনুগত, কেউ হয়ত ভীষণ পারিবারিক, অন্য কেউ খুব বস্তুবাদী কিংবা প্রবৃত্তিপরায়াণ। একজন লেখক এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর চরিত্র সৃজন করেন, তার ভিত্তিতে আমরা লেখকের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারি। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টি অনুযায়ীই আসলে চরিত্র সৃষ্টি করেন। কাজেই চরিত্র কেবল ঘটনার অবলম্বন নয়; কেবল উপন্যাসের একটি উপকরণ নয়; লেখকের জীবনদৃষ্টিরও যথার্থ বাহন।

শিল্পকলা বা আর্টের যে কোনো শাখাতেই জীবন সম্পর্কে শিল্পীর মূল্যায়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। বস্তুত, প্রধানত এ নিরিখেই কাউকে আমরা বড় শিল্পী বলে থাকি। উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসিক কাহিনি বুননের জন্য যেসব ঘটনার সন্নিবেশ ঘটান, যেভাবে চরিত্র সাজিয়ে তোলেন, কিংবা ঘটনা পরস্পরের মধ্য দিয়ে যে পরিণতিকে পৌঁছান, তার ভিতর দিয়ে লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, লেখকের জীবনদৃষ্টির ভিত্তিতেই আসলে কাহিনি, চরিত্র বা পরিণতি গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়। উপন্যাসের ভাষা ও অলঙ্কারের ব্যবহার কেমন হবে, কোন ভঙ্গি বা স্বরে লেখক একটি ছোট ঘটনা বা সংলাপ রচনা করবেন, কিংবা ভালো-মন্দের বোধগুলো তিনি কীভাবে নির্ণয় করবেন, তার সবকিছুই নির্ধারিত হয় ওই জীবনদৃষ্টির নিরিখে। কাজেই বিশিষ্ট জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসের অনিবার্য অঙ্গ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এবার আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন করতে পারি। সংজ্ঞায়ন বলতে বোঝায় কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা। এর দুটি দিক। একদিকে সংজ্ঞায়নে জিনিসটি কী তা বলা হয়, অন্যদিকে কী নয় তাও বলা থাকে। যেমন আমরা যদি বলি, উপন্যাস সাহিত্যের একটা রূপ, তাহলে একই সাথে বলা হল যে, উপন্যাস সাহিত্যের বাইরের কিছু নয়। এখন সাহিত্যেরও নানা রূপভেদ আছে। কাজেই উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন করতে গেলে অন্য রূপগুলোর সাথে এর ফারাক কোথায়, তাও স্পষ্ট করতে হবে। কবিতার সাথে অন্য সাহিত্যরূপগুলোর প্রধান পার্থক্য শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের পদ্ধতিতে—কবিতায় সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থের বিচ্যুতি ঘটে এবং নতুন অর্থ তৈরি হয়। তাছাড়া সাধারণ ভাষার সাথে কাব্যিক ভাষার সুর ও স্বরগত পার্থক্যও ঘটে। উপন্যাসে যেখানে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, নাটকে সেখানে ঘটনা ত্রিমূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়। ছোটগল্পের সাথে উপন্যাসের বেশ মিল আছে। তবে প্রধান পার্থক্য এই যে, ছোটগল্পে প্রকাশিত হয় জীবনের কোনো একটি দিক বা কোনো বিশেষ মুহূর্ত, আর উপন্যাস প্রকাশ করতে চায় জীবনের সামগ্রিকতা। জীবনদৃষ্টি অবশ্য সবগুলো সাহিত্যরূপেরই সাধারণ উপাদান। এসব বিবেচনায় উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ হতে পারে এরকম: উপন্যাস প্রধানত গদ্যে লেখা বর্ণনামূলক সাহিত্যরূপ, যেখানে ঘটনা ও কাহিনীর বিশেষ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-চরিত্র অবলম্বনে জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশের আয়োজন করা হয়, এবং সবকিছু মিলে লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে।

উপন্যাসের বিষয় হতে পারে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম—এক কথায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কিছু। বিষয়ের সাথে সাথে ভাষা এবং ভঙ্গিরও যথেষ্ট বদল ঘটে। যেমন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেকসময় ইতিহাসের সত্য রক্ষার দায় থাকে; আবার আঞ্চলিক জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি অনুগত থাকতে হয়। কিন্তু ভাষা-ভঙ্গি যতই আলাদা হোক, উপন্যাসের মূল উপাদান ও স্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

উপন্যাসকে প্রায়ই আধুনিক জীবনের সাহিত্যরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। মানুষের যাপিত জীবনের সামগ্রিকতা উপস্থাপনের সক্ষমতার জন্য উপন্যাসের এই খ্যাতি। ষোল শতকে ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত হওয়ার সময়েই উপন্যাসচর্চা শুরু হয়েছে বলে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন। পুরনো দুনিয়ায় জীবনের সমগ্রতা ধারণের এ কাজ করত মহাকাব্য। মহাকাব্যের বিষয় ছিল সুদূর অতীতের কল্পিত জীবন। বিপরীতে, উপন্যাসের জগৎ ‘বর্তমানময়’। মানুষ যেমন বহুবিচিত্র, তেমনি বিচিত্র তার ভাষা, স্বভাব ও আচরণ। এ বৈচিত্র্যকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র রূপ ও সামগ্রিকতা প্রকাশের আশ্রয় সক্ষমতা আছে উপন্যাসের। এ দিক থেকে বিশ শতকের শিল্পমাধ্যম সিনেমার সাথে উপন্যাসের তুলনা করা চলে। এ জন্যই হয়ত প্রচুর উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ হয়। উনিশ শতকেই উপন্যাস শিল্পরূপগত দিক থেকে সিদ্ধির চূড়ায় পৌঁছেছিল। বিশ শতকে সে ধারা অব্যাহত থেকেছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কথাটা অংশত সত্য। একুশ শতকেও সম্ভবত সিনেমার সমান্তরালে উপন্যাসের এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

খ. বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আগেই বলেছি, উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শত বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে বাংলা উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে অনেকেই এর বীজ খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনি-কাব্য, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতকের গল্প, মধ্যযুগের বুপকথা, ময়মনসিংহ গীতিকা, রোমান্টিক কাহিনি-কাব্য, নাথ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, আরব্য উপন্যাস, লোকগাথা প্রভৃতি রচনায়। যাই হোক, আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একদিকে ব্যাপক নগরায়ণ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাভিত্ত্য,

শিক্ষা ও সাময়িক পত্রের প্রসার, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দ্বারা সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। নতুন কালের মানুষ নতুন সমাজের কথা প্রকাশের গরজ অনুভব করতে থাকে। এরই প্রভাবে উদ্ভব ঘটে উপন্যাসের।

অনেকে মনে করেন, হানা ক্যাথারিন মুলেপের (১৮২৬-৬১) লেখা ফুলমনি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কেউ কেউ আবার প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)-এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে সবাই মেনে নিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ তাঁর উপন্যাসে দেখা যাবে। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন সামাজিক উপন্যাস। সমাজের নানা অসংগতি, ব্যক্তির কামনা, বাসনা, বেদনা ও দ্বন্দ্বের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। কাহিনি বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের আরেক কীর্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। উপন্যাস রচনাতেও তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। ব্যক্তির মন ও মননের অপূর্ব সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা দেখেছি সমাজের চাপে ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাঁর চরিত্রগুলো সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাওয়া গেল নতুন কালের নারী ও পুরুষকে। মানবিকতার দ্বারা দীক্ষিত হয়ে তারা সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে অর্জন করতে চাইছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দেশপ্রেমে উদ্ভূত হয়ে চাইছে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ভাষার নিরীক্ষা, যুগের প্রতিফলন, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদি দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা বহুল আলোচিত উপন্যাস চোখের বাগি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় ও যোগাযোগ।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালির গৃহকাতরতা এবং আবহমান পারিবারিক আবেগের ওপর ভর করে উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। অর্জন করেছিলেন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের জগতে এরপর আবির্ভাব ঘটে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের- তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)। আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক মাধুর্য, পল্লির স্নিগ্ধশান্ত রূপ, অরণ্য, পাহাড় যে এখনো আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিভূতিভূষণের লেখা পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, আরণ্যক ইত্যাদি উপন্যাস পড়লেই তা বোঝা যায়। তারাকান্তের উপন্যাসে পাই অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্য হারানো জমিদার, নিম্নশ্রেণির বিচিত্র পেশার সাধারণ মানুষের কথা। এই মানুষজন আমাদের চিরচেনা বৈষ্ণবী, কবিয়াল, যাত্রাশিল্পী, মুণ্ডশিল্পী, বেদে, সাপুড়ে, বাজিকর, ঝুমুর দলের নাচিয়ে ইত্যাদি। উঠতি শিল্পমালিক আর শ্রমিকদের জীবনের ছবিও পাওয়া যাবে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, হাসুলী বাঁকের উপকথা, কবি প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) মার্কসবাদের পটভূমিতে ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং (২) ক্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে নর-নারীর জটিল সম্পর্কের বিন্যাস। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা জর্জরিত মানুষের জীবনের ছবি তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে গ্রামীণ বাস্তবতার চিত্র। দিবারাজির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, চিহ্ন, শহরতলী

প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস আরও যাঁরা লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ।

গ. বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি দেশের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলায় সূচনা ঘটে নতুন এক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার। এই সময়েই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের উপন্যাসের। শ্রেণিকরণ করলে বাংলাদেশের উপন্যাসকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

- (১) **গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস** : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু, কাঁদো নদী কাঁদো, চাঁদের অমাবস্যা, আবু ইসহাকের সূর্য-দীঘল বাড়ি, জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে, আবদুল গাফফার চৌধুরীর চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, শওকত ওসমানের জননী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা, হাসান আজিজুল হকের আগুনপাখি, সৈয়দ শামসুল হকের মহাশূন্যে পুরান মাস্টার, সেলিনা হোসেনের দীপাবিত্তা ইত্যাদি।
- (২) **নগর ও গ্রামের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস** : আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুদা ও আশা, শহীদুল্লাহ কায়সারের সংশ্লিষ্ট, সরদার জয়েন উদ্দিনের অনেক সূর্যের আশা, আবুল ফজলের রাজপ্রভাত, আনোয়ার পাশার নীড় সন্ধানী ইত্যাদি।
- (৩) **নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস** : আবুল ফজলের জীবন পথের যাত্রী, রশীদ করীমের উত্তম পুরুষ ও প্রেম একটি লাল গোলাপ, আবু রুশদের সামনে নতুন দিন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই, শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন ইত্যাদি।
- (৪) **আঞ্চলিক ও বিশেষ জীবনধারার উপন্যাস** : আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলি, শহীদুল্লাহ কায়সারের সারেং বউ, শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা, আবু ইসহাকের পঙ্খার পলিষ্ট্রীপ, সরদার জয়েনউদ্দিনের পান্নামতি, শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন, সেলিনা হোসেনের পোকামাকড়ের ঘরবসতি ইত্যাদি।
- (৫) **মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক উপন্যাস** : আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, সৈয়দ শামসুল হকের দেয়ালের দেশ ও এক মহিলার ছবি, শওকত আলীর পিঙ্গল আকাশ, মাহমুদুল হকের খেলাঘর ইত্যাদি।
- (৬) **ঐতিহাসিক ও যুক্তিবুদ্ধিভিত্তিক উপন্যাস** : আবু জাফর শামসুদ্দিনের ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ও পদ্মা মেঘনা যমুনা, শামসুদ্দীন আবুল কালামের আলম গড়ের উপকথা, সত্যেন সেনের অভিশপ্ত নগরী, আনোয়ার পাশার রাইফেল রোট আওরাত, শওকত ওসমানের জলাঙ্গী, রিজিয়া রহমানের বং থেকে বাংলা, মাহমুদুল হকের জীবন আমার বোন, হাসান আজিজুল হকের বিধবাদের কথা, সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী ঘেনেড ও গায়ত্রী সন্ধ্যা, হুমায়ুন আহমেদের আগুনের পরশমনি, জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প, ১৯৭১ ইত্যাদি।

এই বিভাজন ছাড়াও বয়সভেদে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের উপন্যাসিকেরা। ফলে তাঁরা যেমন বড়দের জন্য উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিচিত্র ধারায় বাংলাদেশের উপন্যাস বিকশিত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও শহুরে জীবন, ব্যক্তিক সংগ্রাম ও জাতিগত সংগ্রাম, ইতিহাস ও রাজনীতি—সবকিছুই বাংলাদেশের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। চরিত্রচিত্রণ, ভাষা, আখ্যানশৈলী ইত্যাদি নানা দিক থেকে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশের উপন্যাসিকেরা।

ঘ. উপন্যাসিক পরিচিতি

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার ও টিভি-নাট্যকার। ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কর্মসূত্রে দেশের নানা শহরে তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়। এ কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনাও হয় বিভিন্ন স্কুলে। পরে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে তিনি সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চা ও নাটক-সিনেমা নির্মাণে মনোনিবেশ করেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। বিশেষত বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কনে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। প্রধানত গল্প, উপন্যাস ও নাটক-সিনেমায় জীবনের স্বরূপ উন্মোচনের কাজটি তিনি করেছেন। এছাড়া বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজৈবনিক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। সাবলীল গদ্যভঙ্গি, বহুমাত্রিক হাস্যরস এবং বিষয়গত বৈচিত্র্য তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

কথাসাহিত্যিক ও নাট্য-নির্মাতা হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা কিংবদন্তি হয়ে আছে। বাজারের চাহিদা মেটাতে জনপ্রিয় ধাঁচের বহু গদ্য লিখেছেন তিনি। তবে তাঁর কালোত্তীর্ণ রচনার পরিমাণও অনেক। তিনি একজন নিপুণ গল্পকার। একরৈখিকতা এবং সাংকেতিকতা রক্ষা করে জীবনের বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো চমৎকার ছোটগল্পে। বড় উপন্যাস বেশ কয়েকটি লিখলেও তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি এসেছে মূলত ছোট আকারের উপন্যাস বা নভেলায়।

এ ধরনের রচনার মধ্যে ‘নন্দিত নরকে’, ‘শঙ্খনীল কারাগার’, ‘অচিনপুর’, ‘ফেরা’, ‘এই বসন্তে’, ‘প্রিয়তমেশু’, ‘যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ’, ‘গৌরীপুর জংশন’, ‘চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক’, ‘১৯৭১’, ‘অনিল বাগচীর একদিন’, ‘আগুনের পরশমণি’, ‘আমার আছে জল’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’, ‘জনম জনম’, ‘দ্বৈরথ’, ‘নবনী’, ‘নি’, ‘শূন্য’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ‘কবি’, ‘জোছনা ও জননীর গল্প’, ‘মধ্যাহ্ন’, ‘মাতাল হওয়া’, ‘লীলাবতী’, ‘বাদশা নামদার’ প্রভৃতি তুলনামূলক বৃহৎ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। এছাড়া তিনি জনপ্রিয় চরিত্র হিমু, মিসির আলি ও শুভ্রকে কেন্দ্রে রেখে অনেকগুলো কাহিনি রচনা করেছেন; লিখেছেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি তথা সায়েন্স ফিকশন।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি-জগতে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। একুশের বইমেলা তাঁকে ঘিরে উৎসবের বাড়তি আমেজ পেত। তাঁর নাটক ও সিনেমা প্রায়ই আলোড়ন তুলত বৃহত্তর ভোক্তা-সমাজে। দেশে-বিদেশে তিনি বিপুলভাবে নন্দিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার সাথে দেশ ও মানুষের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকার এবং এক উদার ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সাফল্যের ভিত্তি। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই গুণী এই লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

ঙ. উপন্যাসের আলোচনা: ১৯৭১

১৯৭১ উপন্যাস সম্পর্কে বাজারে এক গল্প প্রচলিত আছে। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই এ গল্প প্রচার করেছেন। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাককে তিনি দিয়েছিলেন বইটির এক কপি। রাজ্জাক নাকি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, যে বইয়ের নাম ১৯৭১, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র সত্তর? সপ্তাহখানেক পরে বাসায় ডেকে নিয়ে হুমায়ূনকে তিনি নাকি একপ্রস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছেন: নিজের মতো লিখবেন, কারো কথা শুনবেন না।

আহমেদ ছাড়া অধ্যাপক রাজ্জাককে নিয়ে যদ্যপি আমার গুরু নামে যে বিখ্যাত বই লিখেছেন, তাতে শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে রাজ্জাকের দৃষ্টিভঙ্গির কতক পরিচয় পাওয়া যায়। জয়নুলের গুরু গাড়ি তিনি নাকি ভীষণ পছন্দ করতেন। বলেছেন, এই ছবিতে আকার আর দূরত্বের যে সমানুপাত ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে, তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এ তথ্য থেকে প্রফেসর রাজ্জাকের শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা হয়, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, তাঁর ১৯৭১ পছন্দ হওয়ারই কথা। বস্তুত, বাস্তববাদী ভঙ্গিতে স্থান ও কালের নিপুণ সমবায়ে চরিত্র ও ঘটনাকে কজায় রেখে হুমায়ূন এ উপন্যাসের কাহিনিকে যেভাবে প্রায় অভাবনীয় পরিণতিতে নিয়ে গেছেন, তা মহৎ সাহিত্যেরই লক্ষণ।

তুলনামূলক ছোট পরিসরে কম কথায় ইশারার গভীরতা সৃজনে হুমায়ূনের নৈপুণ্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭১ সে ধরনের রচনার এক সফল উদাহরণ। ফলে উপন্যাসটি-যে রাজ্জাক পছন্দ করতে পারেন, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই: এ রচনা প্রসঙ্গে তিনি অন্যের উপদেশ গ্রহণ না করার উপদেশ কেন দিলেন?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে রাজ্জাকের উপদেশের গুরুত্ব বুঝতে হবে। একদিকে পার্টি রাজনীতির বিষয়, অন্যদিকে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের কপটতা - এ দুইয়ের বিশৃঙ্খল সমাবেশে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধচর্চার ধারা বেশ কতকটা এলোমেলো। এ ধরনের পরিস্থিতি শিল্পসম্মত মনোযোগের অনুকূল নয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তিত্ববান দৃষ্টিভঙ্গিই কেবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উপন্যাসের পরিণতি পেতে পারে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের যে আবহ তৈরি হয়েছে, তা তিনি পছন্দ করেছেন। অন্যদিকে তিনি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিত্বও স্বীকার করেছেন।

১৯৭১ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রথমই বলতে হয়, এটি প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের কাহিনি, মুক্তিযুদ্ধের নয়। মুক্তিযুদ্ধটা আবিষ্কৃত হয়েছে পরে, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক লেখালেখির এটা অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। একেবারে ছক কষে-মাটি, মানুষ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত অবকাঠামো এঁকে-হুমায়ূন বাংলার এক নিভৃত গ্রামকে বানিয়ে তুলেছেন যুদ্ধের ময়দান। কৌশলটা চলচ্চিত্রের। বিবরণের চিত্রধর্মিতা, চরিত্রের আগমন-তিরোভাব-ক্রিয়া, পটভূমির ফটোগ্রাফিক নির্মাণ সিনেমার কৌশলকেই অরণ্য করিয়ে দেয়। চোখ তো বটেই, কানের ব্যবহারেও পাই সে একই কৌশলের ছাপ।

অন্ধ মীর আলি যেভাবে শব্দ শুনে সাড়া দেয়, তার ভঙ্গি বর্ণনামূলক নয়, চলচ্চিত্রীয়। গুলির শব্দের বর্ণনাগুলোও তাই। লেখক নিজের জিম্মায় জানাচ্ছেন না যে, গুলি হয়েছে; বরং বলেছেন, উপস্থিত লোকেরা এদিক থেকে বা ওদিক থেকে গুলির শব্দ শুনেছে। নিঃসন্দেহে সামরিক অভিযানের আবহ নির্মাণ এবং সিরিয়াসনেসের শৈল্পিক প্রয়োজনেই এই বাড়তি বাস্তববাদী নৈপুণ্য আমদানি করেছেন লেখক।

যুদ্ধটা অবশ্য একপক্ষীয়। অন্যপক্ষ মাঠে অনুপস্থিত। মাঠটা কিন্তু আছে; আর সে মাঠে আছে অন্যের ভূমি, ভূমিতে ক্রিয়াশীল ও বসবাসরত জনগোষ্ঠী। এ মাঠে যুদ্ধ মানেই নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ঝাঁপিয়ে পড়ার নানা কলা আর ছলা। পেছনের জঙ্গলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল সৈন্য লুকিয়েছিল কি না, তাদের

সাথে বন্দি মেজর বখতিয়ার ছিল কি না, কিংবা তাদের আহত কয়েকজনকে কৈবর্তপাড়ার লোকেরা আশ্রয় দিয়েছিল কি না, সেসব কথা কোথাও পষ্ট করা হয়নি। প্রতিটি সম্ভাবনাই আছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এ ধরনের কোনো ঘটনাই নীলগঞ্জের ঘটেনি। কিন্তু দখলদার বাহিনী গোপন সংবাদে ভিত্তিতে এক পরিকল্পিত অভিযানে নেমেছে নীলগঞ্জের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাহলে অভিযান শেষ করে চলে গেলেই হয়।

কিন্তু না। তা হবার নয়। প্রতিটি যুদ্ধেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কিছু অসাধারণ বিশিষ্টতা থাকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক বিশিষ্টতা এই যে, এখানে দূর থেকে উড়ে এসে এক আত্মসী বাহিনী হামলা চালাবে এমন এক অঙ্গনে, যার উপর তার কোনো সমর্থনজনিত অধিকার নেই। সমর্থন না থাকা এবং সমর্থন আদায় করতে না চাওয়া অথবা সমর্থন আদায় করতে পারার সম্ভাবনা না থাকা এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা।

মেজর এজাজ আহমেদের ক্ষোভ ছিল। তার বন্ধু বন্দি হয়েছে বিরোধী জোয়ানদের হাতে। কিন্তু সে ক্ষোভ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সাধারণ মানুষের উপর অযৌক্তিকভাবে আছড়ে পড়তে পারে না। দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধ হলে অন্তত প্রাথমিকভাবে এমনটা হতো না। একপক্ষীয় আরোপমূলক যুদ্ধ বলেই হয়েছে। ওই ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক এজাজ আসলে নিশ্চিত হতে পারছিল না, গ্রামবাসীর সাথে লুকিয়ে থাকা সেনাদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না। যদি নাও থাকে, তাহলেও খুবই সম্ভব যে, কোনো লড়াই শুরু হওয়া মাত্রই নীলগঞ্জের পুরো প্রাঙ্গণ জনমানুষসহ দাঁড়িয়ে যাবে তার বিরুদ্ধে।

ফলে তাকে ছক কষতে হয়েছে পুরো পরিস্থিটাকেই বিরোধীপক্ষ ধরে নিয়ে। তার মানেই হল, এই যুদ্ধে ময়দানের যুদ্ধের চেয়ে ময়দানের বাইরের যুদ্ধ মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; আর মেজর এজাজকে সে লড়াইটাও লড়তে হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নাই, সেখানে যুদ্ধের যে কোনো পদক্ষেপই অন্যায্য হতে বাধ্য। ফলে এজাজ যতই এগিয়েছে ততই জড়িয়েছে অন্যায্য যুদ্ধে।

মেজর এজাজ এ উপন্যাসের সবচেয়ে সুচিত্রিত চরিত্রগুলোর একটি। হুমায়ূন আহমেদের নিরাসক্তি এবং সুমিতি এতটাই প্রত্যয়ী যে, হানাদার বাহিনীর অন্যায্য যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একটি চরিত্রকে তিনি কোনো প্রকার বিবেচ ছাড়াই অঙ্কন করে যান, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এটা আসলে উপন্যাসিকের প্রাথমিক গুণ। উপন্যাসের দিক থেকে বরং দেখা দরকার, এরকম সুঅঙ্কিত একটা চরিত্র শেষ পর্যন্ত কী ধরনের জরুরি দায়িত্ব পালন করে। উপন্যাসের মেজর এজাজ কাকুল মিলিটারি একাডেমির কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম রেশোবা। এসব কথাবার্তা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হুমায়ূন বলে নেন উপন্যাসের শুরুর পরিচ্ছেদেই। উপন্যাস-পাঠকরা হয়তো বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করবেন প্রথম পরিচ্ছেদের মীর আলির পরিচয়জ্ঞাপক অংশেও। উপন্যাসের 'মূল ঘটনা'র বেশ বাইরের জিনিস মনে হতে পারে ওই অংশকে, এমনকি মীর আলি সম্পর্কিত অন্য অংশগুলোকেও। কিন্তু উপন্যাসটির ছোট্ট আয়তনের কথা মাথায় রাখলে ধারণা করা সম্ভব, এ অংশগুলো মূলের মধ্যেই পড়ে; আর তাতে হয়তো আমাদের আরেকবার নতুন করে ভেবে দেখতে হয়, আদৌ মুক্তিযুদ্ধের মূল অংশ কী কী।

মেজর এজাজের কথাই ধরা যাক। এজাজ যদি বেশ রূপবান তরুণই হয়, যদি সে অখ্যাত এক গ্রাম থেকে উঠে আসা জোয়ানই হয়, আর তার নিজের কথামতো ওই রেশোবা গ্রামে তার অন্ধ পিতা নীলগঞ্জের মীর আলির মতোই বাড়ির দরোজায় বসে থেকে থাকে, তাহলে একথাও বলা যাবে, এ ব্যক্তি জন্মসূত্রে খারাপ স্বভাবের নয়। তার অবস্থান ও কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত স্বভাব হিসেবে না দেখে কাঠামোগত সন্ত্রাস হিসেবে দেখার এক জোর

তাগিদ অনুভূত হবে। তাতে উপরিকাঠামোর বেশ কিছু উপাদান মুক্তিযুদ্ধের কাঠামোগত সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস হিসেবে অবিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এর প্রধানটি নিশ্চয়ই জাতিগত ঘৃণা। এজাজ তার সহচর রফিককে কোনো রাখঢাক না রেখেই বাঙালির জাতিগত উন্নতি বিষয়ে তার এবং তাদের নিশ্চয়তার কথা বলেছে। বাঙালি মুসলমানের মুসলমানত্ব যে মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়, বরং তারা যে প্রায় হিন্দুর কাছাকাছি, এ বিষয়েও মেজর এজাজ কোনো অনিশ্চয়তা রাখেনি। আর, এগুলো যে যুদ্ধকালীন আত্মরক্ষা পক্ষের প্রধান আদর্শিক অস্ত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে ওই পক্ষের একজন সেনাপতি হিসেবে এজাজের কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধকৌশলও এসব ধারণার বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা। প্রশ্ন হল, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৎপরতার ফল কী হতে পারে?

ছোট্ট গ্রাম নীলগঞ্জের ছোট্ট জনবসতির উপর এসবের পঁ পঁ গতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৭১ উপন্যাসে। লেখক প্রথমেই শ্রেণি, পেশা, শিক্ষা ও ক্ষমতাসম্পর্কের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলের মানুষদের বিন্যাসটা উপস্থাপন করেছেন। এই ভিত্তিকাঠামো বেশ কিছু সময় ভালোভাবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানি পক্ষ এবং তার সহচর হিসেবে রাজাকার দল ওই ভিত্তিকাঠামোর ভিত্তিতেই আচরণ করেছে। ইমাম, শিক্ষক, জয়নাল মিয়া ইত্যাদি। শিক্ষিত, ক্ষমতাবান, রেডিও আছে কি নেই, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের খাবার সরবরাহের ক্ষমতা আছে কি নেই ইত্যাদি হিসেব-নিকেশ কিছুক্ষণ কার্যকর থাকে। কিন্তু শীঘ্রই ভিত্তিকাঠামো ভিত্তিক এসব বর্ণ ছড়মুড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করে।

তার জায়গা দখল করতে থাকে বর্ণবাদী আচরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুভাষণ, আর পরিকল্পিত সন্ত্রাস তৈরির যুদ্ধনীতি। নিজেদের ঘোষিত যুদ্ধকে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ হিসেবে নিয়ে দখলদার বাহিনী অগ্রসর হয় ধর্ষণ-লুণ্ঠনে। এ স্তরেও শ্রেণি বা অন্য অনেক বর্ণ অকার্যকর হয়ে যায়। আর কে না জানে, আগুন কোনো বাধা মানে না। পাকিস্তানি এবং তাদের দোসররা যে অগ্নিসংযোগে ভীষণ রকমের উৎসাহী ছিল, তার পরিচয় নীলগঞ্জবাসী ভালোভাবেই পেয়েছে।

মেজর এজাজ একজন বুদ্ধিমান মানুষ। সে নিজেও এ দাবি করেছে, আর তার কর্মকাণ্ডও তার প্রমাণ মিলেছে। পাকিস্তানি মিলিটারির শ্রেষ্ঠত্বের মিথ, দেখা যাচ্ছে, নীলগঞ্জেও যথেষ্ট চালু ছিল। তাহলে এজাজের তো বোঝার কথা, নিপীড়ন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে তার বা তাদের জন্য বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে। দুনিয়ার নিপীড়নের ইতিহাস সে কথাই বলে। এজাজরা যে একথা বুঝতে চায়নি, তার প্রাথমিক কারণ, একটা জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া যে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, জাতিগত ঘৃণার কারণে তারা তা অনুমান করতে পারেনি। মূল কারণ আসলে তাদের অনন্যোপায় অবস্থা। দুটি মুখোমুখি পক্ষ সামরিক কেতায় পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তার আদব হয় একরকম। আর কাউকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিপক্ষ বানিয়ে লড়াই করলে তার চরিত্র হবে অন্যরকম। আত্মরক্ষা নিপীড়নের মুখে তখন বিপক্ষের অসামরিক-সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে বাধ্য।

ভেঙে পড়াটা সবার জন্যই বিপজ্জনক। ক্ষমতার স্বাভাবিক ক্রম ও স্তর লঙ্ঘিত হলে ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে যে আদব ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে, তাও ভেঙে পড়তে বাধ্য। তখন বুদ্ধিমান সামরিক কর্তা এজাজের হুক বা হিসেব-নিকেশও আর কাজ করবে না। মীর আলিকে সালাম জানিয়ে দেশের মন ভজানোর চেষ্টা সাময়িকভাবে কাজ করতে পারে; কৈবর্তপাড়ার চিত্রা বুড়ির ছেলের খুনের বিচারের নামে মনা কৈবর্তকে মেয়ে ন্যায়বিচারের একটা বিক্রম তৈরি হতে পারে; কিংবা মনার এগার বছর বয়সী ভাইকে অকারণে হত্যার মধ্য দিয়ে কায়ম করতে পারে ভীতির রাজত্ব। কিন্তু ন্যায়বিচারের গল্প, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিথ, বিশেষ মতাদর্শ বা ধর্মের প্রতি পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষোভের অনুমান-এসবই কাজ করেছে অস্তিত্বের ভয়ে ভীত লোকজনের মধ্যে। চূড়ান্ত পর্যায়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষাপটে অস্তিত্বের ভয় কেটে গেলে এগুলোর কোনোটাই আর কার্যকর থাকবে না।

না। তখন ন্যাংটো মাস্টার উপড় হয়ে তার পাজামা তলতে তুলে করবে; জয়নাল মিয়া সবজাস্তা গোয়েন্দার মতো তথ্য আওড়াতে থাকবে; সবদারউল্লাহ দাঁ হাতে ঘুরে বেড়াবে অনির্দিষ্ট শত্রুর সন্ধানে; আর রফিক দৃষ্ট ভঙ্গিতে নামতে থাকবে বিলের পানিতে।

এখানে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কর্তাসত্তার প্রশ্নটি সামনে আসে, যে কর্তাসত্তার অভূতপূর্ব জাগরণ তাদের নিরীহ আলস্যের বিপরীত চিত্র ধরে আবির্ভূত হয়েছিল 'মুক্তি'র বেশে। প্রশ্ন হল, মেজর এজাজের বহুমাত্রিক নিপীড়নই কি অবদমিত জনতার বিপরীত মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ার একমাত্র কারণ? ১৯৭১-এ হুমায়ূন এ মর্মে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। মেজর এজাজের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ইমাম, মাস্টার, জয়নালসহ অন্যরা যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা যে এক মেধাবী নির্মাণ তা নিশ্চয় করে বলা যায়। এ মানুষগুলো আসলে ভূগোল, উৎপাদন-ব্যবস্থা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ইত্যাদির চেতন-অচেতন মিশেলে অতি বাস্তবের অতি সাধারণ জীবনই যাপন করছিল। ইকবাল-জিন্নাকে নিয়ে তৎপর হওয়া তার এই জীবনের জন্য জরুরি নয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ওদের সবার হয়ত বিরাগ ছিল না। কিন্তু তাই বলে জিন্নাকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা বা ইকবালের কবিতা চর্চা করার কথাও তাদের মনে হয়নি। ঠিক তেমনি নিজের অস্তিত্বের পক্ষে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব বা স্থায়ী বাংলা বেতারের তৎপরতা তাদের চাপা উল্লাসের কারণ হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। 'পাকিস্তান' নামের রাষ্ট্রটির প্রতি তখনো তাদের কারো আবেগ বা নিরপেক্ষ অবস্থান যদি থেকেও থাকে, এজাজের নিপীড়ন সে ব্যাপারে তাদের মায়া কাটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। পরিস্থিতিই অস্তিত্বের শেষ সীমানায় ফেলে দিয়ে তাদের নামিয়ে এনেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই-ই তো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এটাই একমাত্র ভিত্তি, যার জোরে মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বা 'গণযুদ্ধ' বলা যায়।

১৯৭১ উপন্যাসে লেখক তাদেরই উচ্চকিত করতে চেয়েছেন, যাদের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বর্ণেই ফেলা যায় না। আত্মসী বাহিনীর পক্ষেও তাদের নির্বিচারে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা আদৌ সহজ ছিল না। কিন্তু তারা তা করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তারা রাজনৈতিক অবস্থানকে সামরিক কায়দায় মোকাবিলা করেছে। সামরিক কায়দায় মোকাবিলার পছন্দ গ্রহণ করায় পুরো বাংলাদেশটাই তার ভূমি, মানুষ ও অপরাপরা উপাদানসহ এক অতিকায় শত্রুপক্ষ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষকে শত্রু-কোঠায় সক্রিয় হতে বাধ্য করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসার এই প্রক্রিয়াকে হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে গভীর বিশিষ্টতা বলে সাব্যস্ত করেন। এদিক থেকে দেখলে উপন্যাসের পটভূমিকায় মীর আলিকে নিয়ে তুলনামূলক দীর্ঘ বয়ান, এবং এজাজের উল্লেখসূত্রে রেশোবা গ্রামে তার অন্ধ পিতার উল্লেখের অন্য তাৎপর্য উন্মোচিত হয়।

রেশোবা গ্রামের জনৈক অন্ধ পিতার সন্তান নীলগঞ্জের আরেক অন্ধ পিতার সন্তানের জন্য যে বিপর্যয় তৈরি করেছে, যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে তার পরিচয় দেয়া সম্ভবপর নয়। আগেই বলা হয়েছে, এজাজের পক্ষে এ কাঠামোগত সন্তানস্রাব্য কোনো কিছুতেই সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না ব্যক্তিগত জীবনসমূহের বিপর্যয় রোধ করা। ফলে, মীর আলি, যে কিনা ছেলের সম্ভাব্য মৃত্যু আর গ্রামে বিচরণশীল মিলিটারির তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে তার ভাতের ক্ষুধাকে বেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছিল, তার ব্যক্তিগত বিপর্যয় ঠেকানোর কোনো উপায়ই আসলে এজাজের ছিল না, যতই সে নিজের বাবার সাথে এই প্রান্তীয় মানুষটার মিল খুঁজে পাক। একটা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের ওই বিশ্বজনীন সাহুজ্যের বোধ মূলতুবি হয়ে যায়। আর হুমায়ূন হয়তো তুলনাসূত্রেই আমদানি করেন এক কালবৈশাখির চিত্র। ১৯৭১-এ ওই কালবৈশাখি নানারকম দায়িত্ব পালন করেছে।

এজাজের সাহসিকতা ও বোধবুদ্ধির অন্যতম প্রমাণ দাখিল করা থেকে শুরু করে মুক্তিসেনাদের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার কল্পিত বা সত্য ঘটনা ঘটতে দেয়া পর্যন্ত। একটা গুরুতর ব্যাপার এই যে, ঝড়ে মীর আলির ঘরের চালটি উড়ে যায় মানুষ এবং অপরূপ বস্ত্রসামগ্রী যথাস্থানে রেখেই; আর আমাদের জানানো হয় মীর আলির ভাগ্যে আগেও একবার এ ঘটনা ঘটেছিল। সেবার পরিবারটি সামলে ওঠে দ্রুত। কিন্তু এখন, প্রাকৃতিক নীড়নের পাশাপাশি এজাজদের প্রয়োজনায় অধিকতর বিপর্যয়কর যে ঘটনা ঘটছে, যেখানে তার একমাত্র জোয়ান ছেলের ঘরে ফেরার সম্ভাবনা বেশ পরিমাণে তিরোহিত, তা সামলে ওঠার কোনো আশা আর থাকে না। ঝড়-কবলিত মীর আলিকে তাই একান্তরের অন্যায় সমরে সংঘটিত মানবিক বিপর্যয়ের প্রতীক হিসেবে পড়াই সঙ্গত। এ ধরনের অসংখ্য বহুমাত্রিক নিপীড়ন ও বিপর্যয়ের ফলে ধীরে ধীরে বদলে যায় হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কর্মরত টোকস তরুণ রফিক; মেজর এজাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একটুও ভীত না হয়ে, নবলব্ধ মনোবল নিয়ে, এজাজের আশু ধ্বংসবার্তা প্রচার করে, রফিক যখন নামতে থাকে বিলের মৃত্যুর দিকে, তখনই আসলে জন্ম নিতে থাকে বদলে যাওয়া এক নতুন বাংলাদেশ।

রফিক এ উপন্যাসের সম্ভবত সবচেয়ে জটিল চরিত্র। তাকে বাস্তব হিসেবে না পড়ে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে পড়ার নিগূঢ় আমন্ত্রণ আছে উপন্যাসটিতে। পরিষ্কার বলা হয়েছে, রফিক কখনো এ গ্রামে আসেনি। অথচ সে এমনভাবে কাজ করেছে, যেন শুধু নীলগঞ্জের রাস্তাঘাট নয়, মানুষজন এবং প্রাকৃতিক অবকাঠামোও তার খুবই চেনা। উপন্যাসের বর্ণনাধারার বাইরে গিয়ে তথ্যটি দিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং লেখক। সে কোন এলাকার মানুষ তা জানতে চেয়েছিল ইমাম। রফিক জবাব দেয়নি। মেজর এজাজের সহযোগী হিসেবে গ্রামে প্রবেশ করলেও ‘আমরা’ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি হয়েই সে কথা বলেছে। আর এভাবেই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের যে কোনো রফিক।

যুদ্ধই করতে চেয়েছে সে। তাই প্রথম থেকে নিজের অনাচ্ছা জানিয়ে এসেছে অন্যায় নিপীড়নের ব্যাপারে। অবশেষে যখন সে নিশ্চিত হয়েছে, এটা যুদ্ধ নয়, অন্যায় যুদ্ধ মাত্র, তখন প্রতিবাদ ছাড়া তার হাতে আর কোনো উপায় ছিল না। প্রতিবাদটি সে করেছে জীবন দিয়ে। যুদ্ধের শুরুর পর্বে বাংলাদেশের আপামর জনতা যখন বুঝতে শুরু করে, তাদের সামষ্টিক বেঁচে থাকা কেবল ব্যক্তিক জীবনদানের মধ্য দিয়েই সম্ভবপর, তখনই আসলে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে থাকে যুদ্ধে। যুদ্ধ রূপান্তরিত হতে থাকে এক সর্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে। হুমায়ূনের সাহিত্যিকজীবনের অন্যতম মেধাবী নির্মাণ রফিক এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ ধরনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বিলের পানিতে সে যখন নামছিল, ততক্ষণে কৈবর্তপাড়ায় রাজাকাররা আগুন বেশ জমিয়ে তুলতে পেরেছে। আগুনের আলো পড়েছে রফিকের মুখে। আগুনের আঁচে বিলের পানিতে মেজর এজাজের কাছে অচেনা হয়ে ওঠা যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে, সে রফিকই আসলে এ উপন্যাসের একান্তর, এ উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধ।